নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহার করবেন না।
১) DEXTROPROPOXYPHENE (বেদনানাশক ওষুধ-এর সমস্ত ধরণের ফরমুলেশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে)। বাজারে Parvon, Proxyvon, Walagesic নামে বিক্রি হয়।

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ-১০ সংখ্যা - ৩ জুলাই-আগষ্ট/২০১৩ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

আধুনিক ভারতের ১ম বিজ্ঞানী

গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার

আধুনিক ভারতের প্রথম বিজ্ঞানী—রাধানাথ শিকদারকে (১৮১৩-১৮৭০) এই অভিধায় চিহ্নিত করার একটি প্রয়াস সাম্প্রতিককালে নজরে আসছে। বলে নেওয়া ভাল এই প্রয়াস যথাযথ ও ইতিহাস সমর্থিত। যে কারণগুলির জন্য রাধানাথ শিকদার আজ এইভাবে বিবেচিত হচ্ছেন—

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর ১ম ভাগে জরিপ কাজে ব্যবহৃত গণিত বিষয়ে চর্চা প্রয়োগ উদ্ভাবনে তিনি স্বকীয়তার সাক্ষ্য রেখেছেন। এজন্য জীবৎকালে তিনি সরকারি বিভাগে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন।

(২) জার্মানির সুবিখ্যাত ফিলজফিক্যাল সোসাইটির ব্যাভেরিয়ান শাখার সম্মানীয়

এরপর 2 পাতায়

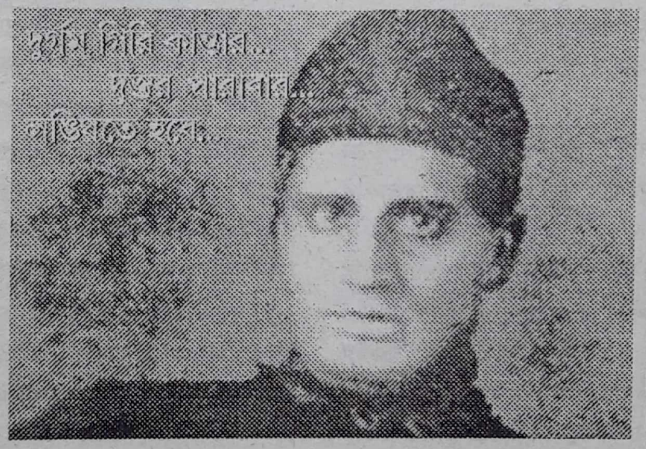

সুন্দরবনের বসতি এলাকার পাখি ঃ একটি সমীক্ষা

সুন্দরবন। নাম শুনলেই বাঙালি তো বটেই, ভারতবাসীর মন গর্বে ভরে ওঠে। আর উঠবে না-ই বা কেন, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীববৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চল। 'ওয়ার্ল্ড' হেরিটেজ সাইট-এর স্বীকৃতি। সর্বোপরি রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যার খ্যাতি জগৎজোড়া। এ হেন সুন্দরবনের ভূমিপুত্র ও স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে আমার গর্ব অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি বইকি।

ভূতাত্ত্বিকরা বলেন, আজ থেকে ২৫০-৩০০ বছর আগে সুন্দরবনের বাদাবন শুরু হত কলকাতার দক্ষিণে ৮-১০ কিলোমিটার থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওই গহন, ভয়াল সুন্দরবনের চোরাকারবারি, জলদস্যু আর বন্য জীব জন্তুদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে রাজস্ব উৎপাদক আবাদি জমিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। সেই শুরু অরণ্য ধ্বংস। ১৭৭০ সাল থেকে শুরু হল চাষের জন্য বনের ইজারা দেওয়া। ১৮১০ সালের মধ্যে সাগরদ্বীপ থেকে ক্যানিং পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জঙ্গল সাফ করে উদ্ধার করা হল আবাদি জমি। বন সাফ করে চাষ আবাদ করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। পুকুর কেটে জলের বন্দোবস্ত করা, বসতবাড়ি তৈরি করা, জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলা, অন্যান্য এলাকার সাথে যোগাযোগ রাখা

এরপর 5 পাতায়

কোন ধরণের খেলনা বেশী বিপদজ্জনক?

নিকনাক Knick Knacks ভিনাইল ডলস (ভিনাইলে তৈরি পুতুল) নরম নরম যে খেলনাগুলোকে সহজেই যা খুশী করা যায়। এছাড়াও ব্যাটারী চালিত খেলনাগুলোও সমান বিপদজ্জনক, ক্ষতিকারক। ব্যাটারি থেকে যেসব ভয়ংকর, Noxious নিঃসৃত উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়, তার অন্যতম হল ডাইক্সিন (Dioxin) এবং বেনজিন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এই রাসায়নিক পদার্থগুলো কারসিনোজেনিক অর্থাৎ এরা মানবদেহে ক্যান্সার তৈরি করতে সাহায্য করে। এছাড়াও স্নায়ুতন্ত্রের গন্ডগোল, জন্মগত ত্রুটি প্রভৃতি হতে পারে। বাচ্চাদের খেলনায় সাধারণত কার্বন, অ্যালকালাইন জিঙ্ক ইত্যাদি নানা ধরণের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। এগুলো

এরপর 4 পাতায়

নদী বন্যা অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ

একালে প্রায় প্রতি বর্ষায় বা বর্ষা শেষে বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের ফলে হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ সেই সঙ্গে শস্যের ক্ষতি হচ্ছে। অথচ ভাবতে অবাক

এরপর 8 পাতায়

বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদার

1 পাতার পর

সদস্যপদ লাভ (১৮৬২)। গণিতে অসাধারণ পারদর্শিতার কারণে এই বিদেশি সম্মানপ্রাপ্তি। তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় এ ধরণের সম্মানে ভূষিত হননি।

(৩) আবহাওয়া বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান ও প্রতিদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানাবার সরকারি ব্যবস্থার তিনিই অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব (১৮৫২-৬২)। এই কাজের সূত্রে তাঁর একাধিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে Asiatic Researches-এর পাতায়। চিফ কম্পিউটার পদের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব সুপারিনটেন্ডেন্ট, আলিপুর অবজারভেটরি।

(৪) চূড়ান্ত পর্যায়ের জরিপ কাজে ছয়টি ত্রুটি (প্রতিফলন, প্রতিসরণ, যান্ত্রিক পরিমাপ বিষয়ক...ইত্যাদি) যথাযথভাবে সংশোধন করে সঠিক পরিমাপ বের করে আনা এক বিরল কৃতিত্বের পরিচায়ক। রাধানাথ শিকদারের একাধিক গণনা , বিশেষ করে 'শৃঙ্গ XV' যা পরে মাউন্ট এভারেস্ট নামে প্রচারিত হয়, তার নিখুঁত গণনা (আধুনিক উপগ্রহ মারফৎ উচ্চতা নিরুপণের তুলনায়) তাঁর জরিপ কাজে অসাধারণ অভিজ্ঞতাকে সূচিত করেছে।

তিনি গুছিয়ে পিএইচডি বা ডি এসসি উপাধির জন্য থিসিস লেখেননি ঠিকই, কিন্তু ১৮৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর দুটি গ্রন্থ জরিপ বিভাগের কাজে বহুল ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত।

(১) Auxiliary Tables — একটি সহজ হ্যান্ডবুক গোছের, যা জরিপকারীদের কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য ম্যানুয়াল বিশেষ।

(২) Manual of Surveying — এই মূল্যবান গ্রন্থের লেখকদ্বয় ছিলেন আর স্মিথ ও এইচ এল থুইলিয়র। বইটির প্রথম (১৮৫১) ও দ্বিতীয় (১৮৫৫) সংস্করণ বাবু রাধানাথ শিকদার বিষয়ে ভূমিকায় উচ্চ প্রশংসা ছিল। কারণ এই গ্রন্থের ৩য় ভাগের পঞ্চদশ, সপ্তদশ থেকে একবিংশ এবং ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ ও সমগ্র ৫ম ভাগ রাধানাথ শিকদার কর্তৃক লিখিত। গ্রন্থের প্রধান গণিত অংশগুলি রাধানাথ কর্তৃক লিখিত। (জঘন্য ঘটনা এই, ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণের ভূমিকা অংশ থেকে রাধানাথের নামটি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। এ নিয়ে সংবাদপত্রের পাতায় তুমুল প্রতিবাদ ওঠে।

তাঁর শিক্ষক-পথ প্রদর্শক স্যার জর্জ এভারেস্ট, এফ আর এস ও পরবর্তী সার্ভেয়র জেনারেল স্যার অ্যান্ড্রুওয়া, এফ আর এস তাঁর সম্পর্কে একাধিকবার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যার লিখিত বিবরণ রয়েছে। আজকের দিন হোলে, নিয়মমাফিক এম এসসি ডিগ্রি না থাকলেও সাম্মানিক ডি এসসি বা রাষ্ট্রীয় পদ্ম পুরস্কার হয়ত তিনি অবশ্যই পেতেন। যে প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে এই অকুতোভয় ডিরোজিয়ান কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার নজির রেখেছেন, তা যুগ বা কালের সীমার বিচারে এক অসাধারণ নজির বিশেষ।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন কলকাতা জোড়াসাঁকোর শিকদার পাড়ায়। ১২২০ (ইং ১৮১৩) আশ্বিন মাস। (সঠিক দিনটি জানা যায় না)। পিতার নাম—তিতুরাম শিকদার। রাধানাথ বড়ো, ছোটো শ্রীনাথ। তিনবোন ও মাকে নিয়ে সংসার চলতো বেশ কষ্টেই।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৮২৪ সালে হিন্দু কলেজে নবম শ্রেণিতে (বর্তমানের ২য় শ্রেণি) ভর্তি হন। ১৮২৭ সালে চতুর্থ শ্রেণিতে (বর্তমানের ৭ম শ্রেণি) উন্নীত হন। মেধাবী ছাত্র রাধানাথ এবার স্বনামধন্য ডিরোজিওর কাছে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পেলেন। অসাধারণ এই যুগন্ধর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব রাধানাথের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ডিরোজিও সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'তিনি প্রথমত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। ...তাঁহারই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। তাঁহার নিকট এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতি মূলক ধারণা লাভ করিয়াছি যাহা চিরতরে আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে। (আর্যদর্শন পত্রিকা, ১২৯১ কার্তিক)।

১৮৩০ সনে সনে অধ্যাপক ডা. টাইটলারের কাছে তিনি নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' অধ্যয়ন করেন। ভারতে সর্বপ্রথম।

ইতিমধ্যে ভারতে পা রেখেছেন গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভের নবনিযুক্ত সর্বেসর্বা (সার্ভেয়ার জেনারেল) জর্জ এভারেস্ট। তিনি গণিতে পারদর্শী এবং সার্ভে কাজেও (জরিপ) তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। তিনি এসেছেন হিন্দু কলেজে ডা. টাইটলারেরকাছে কাজের জন্য একটি ছেলের খোঁজে। যে কিনা গণিতে মোটামুটিভাবে পারদর্শী । ডা. টাইটলার রাধানাথকে দিলেন এভারেস্টের হাতে। তখনও রাধানাথ হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণির ছাত্র (বর্তমানের দশম শ্রেণি)।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রাধানাথ ৩০ টাকা বেতনে জিটিএসে যোগ দেন। ১ম থেকেই তাঁর পদ ছিল কম্পিউটার। ১৮৩২ সনের ৭ই অক্টোবর রাধানথ লেখেন, 'আমি এক্ষণে সারভেয়র নিযুক্ত হইয়া সেরাংবেস লাইনে কাট করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ই অক্টোবর যাত্রা করিব।' (আর্যদর্শন পত্রিকা , কার্তিক, ১২৯১)। বর্তমানে কলকাতার শ্যামবাজার থেকে চিড়িয়ামোড়ের দিকে আসতে ডান হাতে সেই আমলের জরিপের বেশ টাওয়ার আজও এই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহনকরে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৪৩ সালে কর্নেল স্যার জর্জ এভারেস্ট চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ইংল্যান্ড ফিরে যান। কিন্তু তাঁর আমলের সুবিশাল জরিপ কাজ নিয়ে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। 'An Account of the measurement of two sections of the Meridional Arc of India, Engravings' — বইটি পৃথিবীর নানা দেশে উচ্চ প্রশংসিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাধানাথকে এই বইটি উপহার হিসেবে দেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের পদ খালি হলে রাধানাথ, তৎকালীন সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, এই পদে নিযুক্তির জন্য দরখাস্ত করেন। তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার অ্যান্ড্রুওয়া রাধানাথের কৃতিত্বের উচ্চপ্রশংসা করে তার বেতন বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি লেখেন। পত্রটি রাধানাথের গুণপণার মূল্যবান

এরপর 3 পাতায়

বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদার

2 পাতার পর

দলিল বিশেষ।

ভারতীয় ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগ নিজেদের কাজ নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে রিপোর্ট পাঠায় তাতে লেখা ছিল, 'Babu Rashanath Sikdar, a native of India of Brahminical extraction whose mathematical attainments areof the highest order.'

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। রাধানাথের পিতা তিতুরাম শিকদার মীরাটে আসায় রাধানাথ ছুটির জন্য দরখাস্ত করেন বাবার সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে। কিন্তু এভারেস্ট সাহেব একেবারেই নাছোড়। কোনোভাবেই ছুটি মঞ্জুর করতে চান না। বরং চিঠি লিখে রাধানাথের পিতাকে আমন্ত্রণ করলেন দেরাদুনে আসার জন্য এবং হিমালয় দর্শনের অনুরোধ জানিয়ে। চিঠির তারিখ ০৩/০৭/১৮৪০।

জরিপ বিভাগে সমীক্ষার কাজ (Survey) এবং গণনার কাজ (Computation) দুটিতেই তার দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত এবং সর্বোচ্চ গুণমান বজায় রেখেই কর্ম সম্পাদন করতেন। হিমালয় পাহাড়ে ছোটো বড়ো শৃঙ্গের সংখ্যা ১০,০০০-র বেশি। এই ১ম বিজ্ঞানসম্মতভাবে হিমালয়ের সুবিস্তৃত সীমানায় জরিপ কার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাকালু, ফালুট, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি একাধিক সুউচ্চ পর্বতশ্রেণির যথাযথ উচ্চতা নিরূপিত হচ্ছে। সার্ভে বিভাগের বক্তব্য নেপালের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ চালালে মাকালু পাহাড়ের জন্য এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গ ভারতীয়রা কখনও দেখেইনি। ফলে এর ভারতীয় নামের প্রশ্ন উঠে না।

রাধানাথ শিকদারের চূড়ান্ত গণনায় হিমালয়ের 'X V' শৃঙ্গটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ বলে চিহ্নিত হয়। গণনা টেবিলে পিক 'XV' এর মান নির্দিষ্ট হয় ২৯০০২ ফুট। (১৮৫২)। তিনি সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার অ্যান্ড্রুওয়াকে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ জানান। ওয়া সাহেব সমস্ত তথ্যাদি লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। বিস্তারিত আলাপ আলোচনার পর ১৮৫৬ সালে এই তথ্য সর্ব সমক্ষে প্রকাশিত হয়। এই শৃঙ্গের নামকরণ হয় — 'মাউন্ট এভারেস্ট'। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই নামকরণকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সব কিছু জেনে ও বুঝে।

পরবর্তীকালে একাধিক সুবিখ্যাত ব্যক্তি 'এভারেস্ট শৃঙ্গ' গণনায় রাধানাথের স্বীকৃতিতে ইতিহাসের পাতা থেকে বিলুপ্ত করায় উৎসাহী হন। সে অন্য ইতিহাস ও বিতর্কিত।

১৮২৯ সালে কলকাতায় সার্ভে অফিসে যুক্ত হয় আবহাওয়া বীক্ষণ কেন্দ্র। ১৮৫২ সালে রাধানাথ শিকদার অতিরিক্ত দায়িত্বভার কাঁধে নেন আবহাওয়া দপ্তরে অধ্যক্ষতার (সুপারিটেন্ডেন্ট) পদ গ্রহণ করে। এই সময়ে সার্ভে বিভাগে চিফ কম্পিউটার পদে তাঁর বেতন ছিল ৬০০ টাকা মাসিক। (অবশ্য ওই পদে ইউরোপীয়দের মাসিক বেতনের তুলনায় তিনি কম বেতন পেতেন) রাধানাথ আবহাওয়া অফিসের সামগ্রিক কাজের ধারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি প্রত্যহ আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘোষণার ব্যবস্থা চালু করেন। কলকাতায় জাহাজ কোম্পানিগুলি এই ব্যবস্থায় উপকৃত হয়।

১৮৫৭-৬২ রাধানাথ শিকদার সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন মিটিয়রলজি অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটিতে। বাতাসের চাপ, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহের দিক ইত্যাদির নিরিখে তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্রগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকার পাতায়। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা নিবন্ধে আবহাওয়া সূত্র ছিল নিম্নরূপ —

$$C=\frac{B\,(t-32^{0})m-(t-62^{0})b}{1+(t-32^{0})m}$$

১৮৬৪ সালে কলকাতায় বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড় হয়। এ নিয়ে জাহাজ কোম্পানিগুলি সরকারের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টিকরে আবহাওয়া সংক্রান্ত উন্নত মানের পূর্বাভাস জানবার জন্য। তখন চেয়ারে ছিলেন ব্ল্যানফোর্ড। তিনি রাধানাথের প্রস্তুত করা আবহাওয়া বিষয়ক রিপোর্ট ব্যবহার করে সে নথি বিদেশে (ইংল্যান্ড) প্রেরণ করেন। সেখানে রাধানাথ শিকদারের নামটি অনুল্লেখিত থাকে। ১৮৬৭ সালে ১ এপ্রিল আলিপুরে স্বতন্ত্র আবহাওয়া বিভাগ স্থাপিত হয়।

একেবারে ছাত্রাবস্থায় রাধানাথের একটি জ্যামিতি বিষয়ক (সম্পাদ্য) নতুন সমাধান— To draw a tangent to Two Circles' প্রকাশিত হয় Gleanings in Science পত্রিকায়। পেশার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, রাধানাথ পুরো কর্মজীবনটি কাটিয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে গণিত নির্ভর জরিপ সংক্রান্ত ও আবহাওয়া বিষয়ক কাজে। এ কারণেই তাঁর বৈজ্ঞানিক সত্তাটি সর্বাগ্রে আমাদের নজরে আসে।

১৮৬২ সালের মার্চ মাসে রাধানাথ শিকদার ৩০ বছর কাল একটানা কর্মরত থেকে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর অবসরগ্রহণ বিষয়ে সরকারি রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, *'The computing office in Calcutta, under the superintendence of Baboo Radhanath, Chief Computer was engaged in completing the triplicate manuscript volume in General Report of the Parisnath, Hurilong and Chendwar meridional series, and in furnishing elements for the various topographical and Revenue Survey parties requiring then.*

জরিপ কাজে স্যার জর্জ এভারেস্ট প্রবর্তিত 'Ray Trace System' প্রয়োগে রাধানাথের দক্ষতা ছিল সুবিদিত। এজন্য জরিপ বিভাগে তাঁর অপরিহার্যতা সব সময়ই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

রাধানাথ শিকদার অত্যন্ত বলশালী ও তেজী প্রকৃতির ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন সাহেব পেটানোয় তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রসিদ্ধ ডিরোজিয়ানসদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ি, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখের সহায়তায় নানা সমাজসেবা ও সংস্কারমূলক প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবা বিবাহ প্রচলন আন্দোলনের তিনি সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় ৩ বছর কাল প্রকাশ করেন (১৮৫৪-৫৭) এক আনা মূলের 'মাসিক পত্রিকা'। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্যারিচাঁদ

এরপর 4 পাতায়

বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদার

3 পাতার পর

মিত্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রকাশিত হয়েছিল। রাধানাথের একাধিক বাংলা রচনা এই পত্রিকার মুদ্রিত আছে।

১৮৪৯ সালে তিনি ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির অন্তর্গত পুনর্গঠিত নেটিভ কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ। দুই বৎসর পরে সম্পাদক পদে বৃত হন। তিনি বার্ষিক ৫০ টাকা চাঁদা দিতেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪ সালে কাশীপুর কিশোরীচাঁদ মিত্রের (বিখ্যাত প্যারিচাঁদ মিত্রের ভাই) বাসভবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে স্থাপিত 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃৎ সমিতি'র সভ্যপদ গ্রহণ করেন। খ্যাতনামা উপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১ম খণ্ড) 'সেই সময়' উপন্যাসে—রাধানাথ শিকদার নিয়ে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে।

১৮৪৩-র একটি ঘটনা উল্লেখ না করলে রাধানাথ জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঘটনাটি ঘটে ৫ মে, দেরাদুনে। ম্যাজিস্ট্রেট ভ্যান্সিটার্ট অন্যায়ভাবে রাধানাথের কুলিদের ব্যবহার করে বেগার খাটাচ্ছিলেন। রাধানাথের তা নজরে পড়লে নিজের ঘরে সাহেবের মালপত্র আটক করেন। রক্তচক্ষু সাহেবকে বললেন, লিখিতভাবে রসিদসহ চাইলে মালপত্র ফেরত পাওয়া যাবে। সাহেব মোকদ্দমা করলেন। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর রাধানাথের ২০০ টাকা জরিমানা ধার্য হয়। রাধানাথ জরিমানা অর্থ জমা দেন। *কিন্তু সরকারি আদেশ জারি হয় বেগার খাটানো প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হোল।* এই ঘটনাকালে স্যার জর্জ এভারেস্ট বা অ্যানড্রু ওয়া ভারতে উপস্থিত থাকলেও রাধানাথের সমর্থনে একটি কথাও বলেননি। এমনকি রায় ঘোষণা করা হয় রাধানাথের অনুপস্থিতিতে।

শেষ জীবনে তিনি গঙ্গার তীরে চন্দননগর, হুগলির কাছে গোন্দলপাড়ায় বাড়ি নির্মাণ করে বাস করছিলেন। ১৮৭০ সনের ১৭ মে এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মাত্র ৫৭ বছর বয়সে।

বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার (সে সময়ের ইমপেরিয়াল লাইব্রেরি) — এখানেও তিনি কমিটিতে থেকে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে কাজ করেছেন। শেষ বয়সে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিশনে অঙ্কশাস্ত্র পড়াতেন। গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজের উন্নতিতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। আজ ২০০ বছর পেরিয়েও তিনি বিস্মৃত নন। তবে, তাঁর নামে কোন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান নামাঙ্কিত করা হোক, কলকাতার একটি রাস্তা তাঁর নামে চিহ্নিত হোক, তাঁর আবক্ষ মর্মর মূর্তি কোথাও বসানো হোক, তাঁর জীবনও কর্ম তুলে ধরা হোক নতুন প্রজন্মের কাছে—এসব নানাবিধ প্রয়াস তাঁর দ্বিশতবর্ষ পূর্তিকে উজ্জ্বলতর করুক।

— লেখক ঃ দীপক কুমার দাঁ, গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ
মোঃ-৯৪৭৪১৯২৭৯৯

কৃতজ্ঞতা ঃ ১) প্রাবন্ধিক যোগেশচন্দ্র, বাগলের একাধিক রচনা।
২) গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার— দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (০৭-১০-১২)—সম্পাদনা দীপক কুমার দাঁ।

খেলনার বিপদ

1 পাতার পর

বাচ্চাদের পক্ষেই শুধু নয়, দূষণ ডেকে আনে সমগ্র পরিবেশরই। আরেকটি তথ্য ব্যাটারি কিন্তু রিসাইকেল হয় না - তাই এর থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থগুলো মাটি ও বায়ুর দূষণ ঘটায়।

কেন বাচ্চাদেরই বিপদ Risk বেশি কেন?

প্লাস্টিকের খেলনা থেকে যে দূষণ ছড়ায় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবাই - পরিবেশ ও আমরা। দূষণজনিত স্বাস্থ্যসমস্যা সবচেয়ে বেশি বর্তায় বাচ্চাদের ওপর কারণ —

১। বাচ্চাদের শরীর খুব ছোট, কমনীয় ও নরম প্রকৃতির হয়, তাই সহজেই এই বিপদজ্জনক রাসায়নিকগুলো স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে অন্যান্য অঙ্গে জমা হতে পারে।

২। মস্তিষ্কসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলোর বৃদ্ধি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেহেতু তখনও চলতে থাকে, তাই বেশি পরিমাণে এই রাসায়নিকগুলো জমা হতে থাকলে তা ওই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে। এর ফলে বৃদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়, দেখা দিতে পারে অস্বাভাবিক গঠনও ।

৩। বাচ্চাদের প্রায় সব জিনিসই মুখে দেওয়ার এক অদ্ভুত প্রবণতা থাকে। ফলে, প্লাস্টিকের খেলনা থেকে খুব সহজেই দূষিত পদার্থগুলো বাচ্চাদের পেটে চলে যায়। যত সহজে এই পদার্থগুলো বাচ্চাদের দেহে ঢোকে, তত সহজে এরা দেহ থেকে বেরোয় না। কারণ, রক্তের মাধ্যমে এইসব টক্সিন বা ভারী ধাতবগুলো মূলত যকৃত, অস্থি প্রভৃতি অঙ্গে জমা হত থাকে। পরিণতিতে দেখা দেয় বাচ্চাদের নানা স্বাস্থ্যসমস্যা।

বিপদ থেকে বাঁচতে!!

প্লাস্টিকের খেলনা থেকে দূষণ এবং সেই দূষণ থেকে বাচ্চাদের ও আপনার স্বাস্থ্য সমস্যা - এই দুই বিপদ থেকেই আপনি বাঁচতে পারেন!

কী করবেন—

ক) প্লাস্টিকের খেলনা কেনা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

খ) একদম এড়ানো সম্ভব না হলে, যতটা পারেন কম প্লাস্টিকের খেলনা কিনুন।

গ) এই ধরণের খেলনাগুলোকে ডিসপাজিং করবেন না, বরং এগুলো যাতে রিসাইকেল করা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) বিকল্প পরিবেশবান্ধব খেলনা যেমন - কাপড়ের বা কাঠের খেলনা দিয়ে বাচ্চাদের ভোলাতে চেষ্টা করুন।

ঙ) বাচ্চাদের এমন খেলনা কিনে দিন যাতে ওঁদের কল্পনাশক্তি, চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ হয়।

চ) প্লাস্টিকের খেলনার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলুন।

ফলে, বিশ্বের অনেক দেশেই আজকের সচেতন মা-বাবা তাঁদের আদরের সোনামণিদের জন্য খুঁজছেন বিকল্প খেলনা। প্লাস্টিকের খেলনার বদলে অন্য কিছু - যা একদিকে পরিবেশ বান্ধব হবে, অন্যদিকে ইনডোর পলিউশন তৈরি করবে না। ফলে বাচ্চাদের স্বাস্থ্য থাকবে সুরক্ষিত। বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে তাই আজকের সচেতন মা-বাবা ফিরে পেতে চাইছেন তাঁদের নিজেদের ছোটোবেলার খেলনাগুলোই। প্লাস্টিকের নয়, কাপড়ের বা কাঠের পুতুল দিয়ে ভোলাতে চাইছেন বচ্চাদের। বিজ্ঞানীরা বলেছেন রঙ না করা, কাঠ দিয়ে বানানো পুতুলগুলোই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ বাচ্চাদের জন্য। সোলার পাওয়ারড় টয়গুলোও বিকল্প পরিবেশ বান্ধব খেলনা হিসেবে একেবারে ফেলনা নয়।

— লেখক ঃ ড. সোমা বসু, মোঃ-৯৪৩৩৯৪১৭৭৬

সুন্দরবনের বসতি এলাকার পাখি

1 পাতার পর

এবং বন্য হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তাই কোম্পানি চাষীদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়। এমনই এক চাষী ছিলেন আমার প্র-প্রপিতামহ।

ছোটবেলায় ঠাকুমার মুখে শোনা অতীত সুন্দরবন এলাকার নানা কাহিনী আজও মনে গেঁথে আছে। যান বলতে নদীপথে ডিঙি নৌকো, নয়তো পদযুগল, পাড়া বলতে দু'চারটে কুঁড়ে ঘর, পাশের পাড়া মানে মাঝে দু'তিন মাইলের ব্যবধান। চিকিৎসা বলতে বুনো গাছ-গাছড়ার রসই ভরসা। বাঁচার তাগিদেই উত্তরাধিকার সূত্রে ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যা জেনে নিতেন যে সময়ের সুন্দরবনবাসীরা। জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘ ও সাপ এই ভয়ঙ্কর ত্রয়ীর বিরুদ্ধে নিয়ত যুঝতে হত। ছোটদের পড়াশুনার কোনও বালাই নেই, কারণ স্কুলই ছিল না। কিন্তু খাবারের তেমন কোনও অভাব ছিল না। মাঠে ধান, সব্জি, গাছে ফল, পুকুর, খালে, বিলে অঢেল মাছ, কাঁকড়া ও চিংড়ি, গোরুর দুধ, বুনো মোরগ, পরিযায়ী হাঁস, বক, ডাহুক, শামুক খোরের মাংস, আর ছিল মুক্ত নির্মল বাতাস, ছিল না শব্দ দানব। সাঁঝ-সকাল মুখরিত হয়ে উঠত চেনা-অচেনা হাজারো পাখির কলকাকলিতে।

আমার শৈশবেও দেখেছি, খালের দু'পাড়ে, নদীর পাড়ে, শ্মশান ও তার সংলগ্ন জমিতে পুরনো সুন্দরবনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ম্যানগ্রোভ গাছের ঘন ঝোপ। তারপর যত সময় এগিয়েছে, যতই সভ্যতার চাকা দ্রুত বেগে গড়িয়েছে, যতই সুসভ্যতার আলোক ছড়িয়ে পড়েছে, ততই পাল্টে গিয়েছে সুন্দরবনের চেহারা। সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাদ দিলে ভারতীয় সুন্দরবনে বসতি এলাকা তো কম নয়—৪৮টি দ্বীপ মিলিয়ে প্রায় ৫৩৬৭ বর্গ মিটার এলাকায় আজ মনুষ্যবসতি, নাগরিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপেও। স্বাভাবিকভাবেই সুন্দরবনের বসতি এলাকার মাটি ও জলের চরিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও স্বাভাবিক ফসল। হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, মাছ, উভচর ও কীটপতঙ্গ।

সুন্দরবনের বসতি এলাকায় পাখিরা ছিল দুপ্রকার - স্থায়ী ও পরিযায়ী। ৪০-৫০ বছর আগেও এইসব অঞ্চলে অনেক খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ, ভেড়ি ইত্যাদি ছিল। কিন্তু জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, রাস্তা-ঘাট বৃদ্ধি, জীবিকা পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে জলাভূমির পরিমাণ দ্রুত কমছে। আবার যতটুকু আছে তা দূষণ-জীর্ণ ফলে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে, বাবার মুখে শুনেছি বাবা নাকি ছোটবেলায় অব্যর্থ লক্ষ্যে প্রায়সই ঢিল ছুঁড়ে প্রায়শই শামুকখোর শিকার করত। সুন্দরবনের বসতি এলাকায় গত ৫০ - ৬০ বছর শামুকখোর আর আসে না। ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের পুকুরপাড়ে মাছের টোপ দিয়ে টিকিধারী বক ও ডাহুক পাখি ধরার খাঁচা বসাত পাড়ার ছেলেরা। এখন ওই দুয়েরই সংখ্যা কমেছে। তাই খাঁচাও আর কেউ বসায় না।

পুকুরে পানকৌড়ি তাড়া করে পানকৌড়ি ধরার যে কী মজা তা এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বোঝানো যাবে না। তখন ইনকিউবেটারে মুরগীর বাচ্চা তৈরি করার চল ছিল না। দেশি মুরগী ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাত। তারপর মাস দুয়েক ধরে মা মুরগি তার বাচ্চাদের সাথে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খাবার চেনাত ও প্রকৃতির সাথে অভিযোজিত করত। ওই সময় বহুবার দেখেছি, আকাশ থেকে বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় যমদূতের মতো কোনও বাজপাখি বা চিল নেমে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিত একটা বাচ্চা। নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী মুরগি ছানার চিৎকার কোনও এক উঁচু গাছের পাতার আড়ালে মিলিয়ে যেতে বেশি সময় নিত না। পুকুর সেচার সময়ও দেখেছি জল কমে যাওয়ার সাথে সাথে একই কায়দায় মাচ শিকার করতে। এখন মুরগীরা নিশ্চিন্ত! বাজ বা চিল আর দেখাই যায় না।

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে খালের পাড়ে ছিল একটা ভাগাড়। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা মৃত গরু সেখানে ফেলা হতই। মুচি এসে গরুর চামড়া কেটে নিতে না নিতে হাজির হয়ে যেত কুকুর আর শকুনের দল। ডারউইনের তত্ত্বে পড়া সম প্রজাতি ও বিসম প্রজাতির জীবন সংগ্রাম খুব কাছে থেকেই ওই ভাগাড়ে প্রত্যক্ষ করেছি। শকুনে-শকুনে, শকুনে-কুকুরে, কুকুরে-কুকুরে মারামারির চিৎকার বাড়িতে বসেই শোনা যেত। আমাদের একটা তাল গাছে শকুনের বাসা ছিল, বিকেলের দিকে প্রায়শই দেখতাম আকাশে অনেক উঁচুতে ডানা প্রসারিত করে এক জায়গায় শকুনের দল গোল হয়ে উড়ছে। এখন ভাগাড়ও নেই, আর শকুনও নেই।

গরমের ছুটিতে দুপুর বেলা খাট থেকে নেমে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আমগাছের তলায় তলায় ঘোরার সময় শুনতাম পাশে নারকেল বা খেজুর গাছের গায়ে ঠকাঠক্ শব্দ। চোখ ঘুরে বেড়াত মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভাঙা সেই শব্দের উৎস সন্ধানে। দেখতাম ঝুঁটিওলা লাল-কালো-হলুদ রঙ কাঠঠোকরা এক মনে ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাকলের ভেতর থেকে পোকা বার করছে। হঠাৎ পুকুরে ঝপাৎ শব্দ। মাথা ঘোরাতেই দেখি তুঁতে রঙা বিদ্যুৎ যেন জল থেকে উঠে যাচ্ছে ঊর্দ্ধপানে। দু' ঠোঁটের মাঝে মাছ ধরে পুকুর পাড়ে নিমগাছের ডালে বসে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিত মাছ রাঙা। এখন মাছরাঙাদের মাঝে মধ্যে দেখতে পেলেও কাঠঠোকরাদের ঠকাঠক্ শব্দ শুনতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

আমাদের উঠোনের পাশে প্রতি বছর মাচা তৈরি করে চিচিঙ্গে চাষ করা হত। আর হলুদ-কালো হাঁড়িচাচা এসে মাচায় ঝুলে থাকা চিচিঙ্গে খেয়ে যেত। হাঁড়িচাচাদের ভয় দেখাতে আমার বাবা প্রতি বছর লাঠি পুঁতে তার মাথায় হাঁড়ি বসিয়ে কাকতাড়ুয়া বানাত। কাকতাড়ুয়াকে বাবার ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরাতে আর হাঁড়িতে চুন দিয়ে চোখ-মুখ-নাক আঁকার ভার পড়ত আমার উপর। আবার অঘ্রান মাসে ধান পাকলে ঝাঁক-ঝাঁক টিয়া এসে বসত ধান ক্ষেতে। টিয়ার গায়ের রংয়ের সাথে ধান গাছের সবুজ রঙ এতটাই মিশে যেত যে বোঝা যেত না। টিয়াপাখি তাড়ানোর জন্য একটা চমৎকার ব্যবস্থা করা হত। জমির মাঝে একটা তেলের টিন একটা খুঁটির সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। টিনের সাথে বাঁধা হত

এরপর 6 পাতায়

সুন্দরবনের বসতি এলাকার পাখি

5 পাতার পর

আর একটা দড়ি যার শেষ প্রান্ত থাকত আমাদের বাড়িতে। দড়ির প্রান্ত ধরে ঝাকুনি দিলেই টিন সজোরে খুঁটির গায়ে ধাক্কা খেত, ফলে জোর শব্দ হত, আর ভয় পেয়ে উড়ে পালাত টিয়ার ঝাঁক। এখন আর টিয়া নেই, ফলে টিন বাজানোরও প্রয়োজন নেই।

আমাদের পুকুর পাড়ে ছিল অনেকগুলো তালগাছ। প্রায়শই দেখতাম তাল গাছের পাতা থেকে উল্টানো কলসির মতো ঝুলে আছে অনেকগুলো বাসা। পরে জেনেছি ওগুলো বাবুইয়ের বাসা। ছোট্ট ঝুড়ির মতো বেনে বৌয়ের বাসাও দেখেছি কুল গাছের ডালে। এখন ওদের কদাচিৎ দেখতে পাই। যেমন কদাচিৎ দেখতে পাই গোশালিক আর বনকাক বা কুকো। মাঠে ও খালের ধারে সাদা-কালো গোশালিক আর পুকুর পাড়ে বনকাকদের প্রায়শই ঘোরাঘুরি করতে দেখতাম। ওরা এখন খুবই বিরল।

আর ছিল চড়ুই, খামারে রোদে ধান, গম মেলা ছিল দায়! চড়ুইয়ের দঙ্গল হাজির হয়ে যেত। কিচমিচ্ করে জানান দিত তার উপস্থিতি। ধানগাছ কেটে শুকানোর জন্য যখন মাঠে ফেলে রাখা হত তখনও ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে ধান খেতে আসত। তখন টিন বাজিয়ে চড়ুইও তাড়াতাম, আমাদের টালির চালের ফাঁকে ওদের বাসা করতে দেখেছি। এখন সুন্দরবনের গ্রাম এলাকায় চড়ুই নেই বললেই চলে। শহর ও হাট-বাজারে অল্প কিছু চড়ুই অবশ্য আজও দেখা যায়।

স্কুলে পড়ার সময় কত দিন স্কুলের জানালা দিয়ে দেখেছি ঝুঁটি-ওয়ালা মোহনচূড়া পাখি জোড়ায় জোড়ায় মাঠে ঝরে পড়া শুকনো পাতার মধ্যে পোকা খুঁজছে। ওদের মাথার ঝুঁটি থেকে ফোল্ডিং হাতপাখার মতো খুলত ও বন্ধ হত। ভারি সুন্দর লাগত। দ্রুত পদক্ষেপে লেজ নাচাতে নাচাতে জোড়ায় জোড়ায় খঞ্জন পাখিদেরও মাঠে পোকা খুঁজতে দেখতাম। সম্প্রতি সমুদ্রতটে বেশ কিছু খঞ্জন দেখলেও মোহনচূড়া আর দেখতে পাই না।

সন্ধ্যেবেলা প্রায়শই পুকুর পাড়ে শিরিষ গাছে থেকে তীব্র কর্কশ স্বরে 'বো-ও-ও' আওয়াজ শুনতে পেতাম। ডানা ঝাপটে উড়ে যেতেও দেখেছি। ঠাকুমা বলত কালপেঁচা, মানে ভুতুম পেঁচা, খুব উপকারী পাখি। প্রচুর ইঁদুর, শিকার করে ফসল রক্ষা করত। ওরা সম্ভবত আর নেই। তবে লক্ষ্মী প্যাঁচারা অল্পসল্প এখনও বেঁচে আছে। হয়তো নামের সাথে লক্ষ্মী থাকায় মানুষের হাতে ওদের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়নি। তবে লক্ষ্মী প্যাঁচার চোরাকারবারীরা এতটাই সক্রিয় যে ওদের হাত এড়িয়ে কতদিন লক্ষ্মী প্যাঁচাদের টিকিয়ে রাখা যাবে জানি না।

সুন্দরবন অঞ্চলের বসতি এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যেতে বসা পাখিদের সঠিক তত্ত্বতালাশ করা পক্ষি গবেষকদের কাজ। অসংখ্য চেনা-অচেনা পাখি দেখে ও তাদের কল-কাকলি শুনতে শুনতে শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করেছি সুন্দরবনের অখ্যাত ও প্রত্যন্ত এক গ্রামে। যে সব স্মৃতি আজও অমলিন। এখন শহরে বিষ বাষ্পের ঘ্রান নিতে নিতে আর যানবাহনের ইলেকট্রিক হর্ণের তীব্র চিৎকারে কর্ণপটহকে যন্ত্রণাকাতর করতে করতে ভাবি, কোনও এক জাদুমন্ত্র বলে যদি ফিরে পেতাম ফেলে আসা সেই সোনালি দিনগুলো।

তথ্যসূত্র ঃ ১) সাধারণ পাখি ঃ সেলিন আলি ও লাইক ফতেহ্ আলি, ২) বাংলার পাখি ঃ অজয় হোম, ৩) সুন্দরবন ঃ রবীন্দ্রনাথ দে, ৪) ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট।

—ঃ ভারতীয় সুন্দরবনের বসতি এলাকায় পাখিদের তালিকা ঃ—

সাধারণ নাম	বিজ্ঞান সম্মত নাম	ইংরেজি নাম	প্রকৃতি	উপস্থিতি
পানকৌড়ি	*Phalacrocorax niger*	*Little Cormorant*	স্থায়ী	++
কোঁচ বক	*Ardeola grayii*	*Pond heron*	স্থায়ী	++
গো বক	*Bulbulcus ibis*	*Cattle egret*	স্থায়ী	++++
ধড় বক	*Egretta alba*	*Large egret*	স্থায়ী	+
ধড় বক	*E. intermedia*	*Median egret*	স্থায়ী	++
করচে বক	*E. garzetta*	*Little egret*	স্থায়ী	++++
বাচকা	*Nycticorax nycticorax*	*Night heron*	স্থায়ী	+
শামুকখোর	*Anastomus oscitans*	*Open billed stork*	স্থায়ী	নেই
মদনটাক	*Leptoptilos javanicus*	*Smaller adjistant*	স্থায়ী	নেই
শঙ্খচিল	*Haliastur indus*	*Brahmimy kite*	স্থায়ী	নেই
ঘুঘু	*Streptopelia chinansis*	*Spetted deve*	স্থায়ী	++++
টিয়া	*Prittacula Krameri*	*Rose ringed parakut*	স্থায়ী	+
কোকিল	*Eudy namys scolopacea*		স্থায়ী	+++
কুবো	*Centropus sinensis*	*Crow pheasant*	স্থায়ী	++
তালবাতাসি	*Cypriurus parves*	*Palm Swdift*	স্থায়ী	+
ফটকা মাছরাঙা	*Ceryle rudis*	*Pied kingfisher*	স্থায়ী	+++
সাদা গলা মাছরাঙা	*Haleyon orientatis*	*White-Collared kingfisher*	স্থায়ী	++
কাঠঠোকরা	*Dinopium benghalense*	*Golden backed wood pecker*	স্থায়ী	++
কাঠঠোকরা	*Picoides macei*	*Fulvous brested pied wood pecker*	স্থায়ী	+
বাঁশপাতি	*Merops orientatis*	*Small green bee eater*	স্থায়ী	++

এরপর 7 পাতায়

সুন্দরবনের বসতি এলাকার পাখি

6 পাতার পর

ফিঙে	Dicrurus adsimilis	Bronzed drongo	স্থায়ী	+++
শালিক	Acrido theres tristis	Common Myna	স্থায়ী	++++
গোশালিক	Sturnus Contra	Pied myna		
পাতিকাক	Corvus spendens	Commonhouse	স্থায়ী	++
দাঁড়কাক	C. macrorhynchos	Jungle crow	স্থায়ী	++++
হাঁড়িচাচা	Dendrocitta Vagabuda	Tree Pie	স্থায়ী	++
বুলবুলি	Pycnonotus cafer	Red vented bulbul	স্থায়ী	+++
চাক দোয়েল	Rhipidura albogularis	White spotted tantailed fly catcher	স্থায়ী	নেই
টুনটুনি	Orthotomus suterius	Tailer bird	স্থায়ী	++
ফুটকি	Prinia socialis	Indian rain warbler	স্থায়ী	++
দোয়েল	Capsychus sanlarides	Magbie robin	স্থায়ী	++
দুর্গা টুনটুনি	Nectarinia asiatica	Purp'e sunbird	স্থায়ী	+
মৌটুসি	N. zeylonica	Purple rumped sunbird	স্থায়ী	++
চশমা পাখি	Zosterops palpebrosa	White eye	স্থায়ী	+
চড়াই	Passer domesticus	House sparrow	স্থায়ী	+
কাবামি	Coracina melanoptera	Black-headed cuckoo shrike	স্থায়ী	+
বড়ো কাবামি	C. novaechallandile	Large cickeo shrike	স্থায়ী	+
শ্যামসুন্দর	Lonchura malacca	Black-headed munia	স্থায়ী	+
বনমালী	Citta frontalis	Velvet fronted mithatch	স্থায়ী	++
লালবুলবুলি (সাতসয়ালী)	Pericrocotus flammeus	Scarlet minivet	স্থায়ী	+
ছাতারে	Turdoides straitus	Jungle babler	স্থায়ী	++++
কণ্ঠি ঘুঘু	Streptopelia decaocto	Ring dove	স্থায়ী	নেই
কালো ফুটকি	Chisticola junchidis	Stricked fantail fly catcher	স্থায়ী	++
দামা	Zoothera citrina	Orangeheaded ground thrush	পরিযায়ী	+
খঞ্জন	Motacilla caspica	White wagtaii	পরিযায়ী	++
আবাবিল	Hirundo rustica	Common swallow	পরিযায়ী	++
ছোট পুলিন্দা	Numenlns phadneopus	Whimbrel	পরিযায়ী	নেই
জৌরালি	Limosa limosa	Blacktailed godwit	পরিযায়ী	নেই
কাদাখোঁচা	Tringa hypoleucos	Common Sandpiper	পরিযায়ী	নেই
লাল কাঁক	Ardea purpurea	Purple heron	স্থায়ী	+
ডাহুক	Amaurornis phoenicurus	White brested waterhen	স্থায়ী	++
জলপিপি	Metopidius indicus	Bronze winged jacana	স্থায়ী	+
টিটি পাখি	Vanellus indicus	Redwatled lapwing	পরিযায়ী	+
চিল	Milvus migrans	Black kite	স্থায়ী	+
বাজ	Accipiter badius	Falcon	স্থায়ী	+
শকুন	Gyps bengalensis	Bengal Vulture	স্থায়ী	নেই
ভুতুম পেঁচা	Bubo bubo	Great horned owl	স্থায়ী	+
লক্ষ্মী পেঁচা	Tyto alba	Barn owl	স্থায়ী	++
মোহন চূড়া	Upupa epops	Hoopoe	স্থায়ী	নেই
বসন্ত কৌরি	Megalaima haemacephala	Crimson brested barbet	স্থায়ী	নেই
বেনে বউ	Oriolus xanthornus	Black headed oriol	স্থায়ী	++
কাটকাটিয়া	Hypothymis azurea	Black-naped fly catcher	স্থায়ী	+
পাপিয়া	Hierolocoyx varius	Common Hawk Cuckoo	স্থায়ী	+
মেঘ হাও মাছরাঙা	Pelargopsis capensis	Storkbilled king fisher	স্থায়ী	+++
বড়ো সোনালি পিঠকাঠঠোকরা	Chrysocolapter suttacristatus	Greater flameback wood pecker	স্থায়ী	++
কৌশি পোয়াই	Sturnus malabaricus	Chestnut tarled starling	স্থায়ী	+++
পিয়িং হাঁস	Anas strepera	Gadwall	পরিযায়ী	+
নীলালা বসন্ত কৌরি	Megalaima asiatica	Blue throated barbet	স্থায়ী	+
ছোটো মাছরাঙা	Alcedo atthis	Common kingfisher	স্থায়ী	+

+ = কদাচিৎ দেখা যায়। ++ = অল্প সংখ্যক দেখা যায়। +++ = সামান্য কমলেও মোটামুটি সন্তোষজনক উপস্থিতি। ++++ = যথেষ্ট সংখ্যক উপস্থিতি।

লেখকঃ সৌম্যকান্তি জানা, পূর্ববাজার, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৩৪৭, চলভাষ -৯৪৩৪৫৭০১৩০, ই-মেলঃ janasoumyakanti@gmail.com

নদী বন্যা অভিশাপ নয় আশীর্বাদ 1 পাতার পর

লাগে, শত সহস্র বছর আগেও এদেশের নদী বিজ্ঞানীরা নানা কৌশলে নদীকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন অর্থাৎ নদীকে নিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল অতীত ভারতে জানা ছিল। স্মরণ করা যায় মিশরে নীল নদীর উপর আসওয়ান বাঁধা দেওয়া ছিল খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৪ হাজার বছর আগে। এদেশের বিজ্ঞানীরাও নদী বাঁধ ও প্রাকৃতিক জল ধারা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। বলা বাহুল্য একারণেই অতীতে এদেশ সুজলা সুফলা ছিল।

অতীতে এদেশে নদী সাধারণত যাতায়াতের পথ (নেভিগেশন) সেই সঙ্গে জলসেচ ব্যবস্থার (ইরিগেশন) সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুটিই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ রাজত্বকালে শুধু নয় এর আগে মোসলমান যুগেও এদেশের নদী নালা, খাল বিলের ওপর নজর দেওয়া হয়নি। যার জন্য, অতীত ভারতের অতি উন্নত নদী বিজ্ঞান বিষয়টি ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার মত লোপ পেয়ে গেল। আজকের দিনে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গেও নদী বিজ্ঞান জড়িত। (ভাগ্যের পরিহাস, একালে বিশেষজ্ঞ ডাকতে হয় বিদেশ থেকে)

বাংলার নদী-নালা সম্পর্কে বিশিষ্ট পর্যটক বার্নিয়ের (Bernier) সামান্য একটু মন্তব্য এখানে দেওয়া হচ্ছে। ১৬৬০ খ্রীঃ নাগাদ বার্নিয়ে সাহেব দুবার বাংলায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন ঃ *"The knowledge I have acquired of Bengal in two visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cottons and silks, rice, suger and butter... From Rajmahal to the sea in an endless number of canals, cut in bygone ages from the Ganges by immense labour, for navigation and irrigation, while the Indian cousiders the ganges water as the best in the world" (Leatures on the Ancient system of Irrigation in Bengal, by Sir William Willcocks, Published by University of Calcutta, 1980, Page 18-19)*

বিশ্ববিখ্যাত নদী বিজ্ঞানী উইলিয়াম উইলকক সাহেব সখেদে বলেছিলেন ইংরেজদের মত সভ্যরাও অতীত ভারতের নদী বিজ্ঞান বিষয়টার গুরুত্ব দেয়নি। যেমন দেয়নি এদের পূর্বস্থায়ী মোসলমান শাসন কর্তারা। তারও আগে শত সহস্র বছর অতীতে হিন্দু রাজাদের আমলে এদেশের অধিকাংশ খাল ছিল মানুষের তৈরি। আসলে যাতায়াত অথবা সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার কারণে। এছাড়া ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় ছিল বিশেষ স্থানে খাল কেটে বাড়তি জলকে অন্য দিকে বয়ে দেওয়া। একালে বন্যাকে অনেকে (এমনকি বিজ্ঞান লেখক) অভিশাপ রূপে বর্ণনা করছেন। অথচ এদেশের পূর্বপুরুষরা এককালে একে প্রকৃতি আশীর্বাদ রূপে দেখতেন। কেননা জমির উর্বরা শক্তি বাড়াতে বন্যা ছিল সহায়ক।

— লেখক ঃ রণতোষ চক্রবর্ত্তী, ফোন ঃ (০৩৩) ২৫৪২১১৬৭
নবপল্লী, শিবতলা, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৬

চিঠি

পত্রে নমস্কার নেবেন। আপনাদের বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার মার্চ-এপ্রিল '১৩ সংখ্যা - ২৬/০৬/২০১৩ তারিখ পেয়েছি। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা এবং বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলাই পত্রিকার মূল লক্ষ্য বলে মনে হয়েছে। এ সংখ্যায় অরণ্য সম্পদ ধ্বংসের বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। অরণ্য ধ্বংস সহ প্রকৃতির উপর অত্যাচার করাই উত্তরাখন্ডে প্রকৃতি তার চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। ওখানে নাকি ২০০টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ চলছে—একথা রেডিওতে বললেন কল্যাণ রুদ্র মহাশয়। উন্নয়নের নামে কিছু মানুষের ভোগ লালসা পূরণ করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ পথের ভিখারী হলেন। এর শেষ কোথায় ?

আপনাদের একটি তথ্য বিষয়ে যাচাই করার অনুরোধ জানাই। মাস খানেক আগে রেডিওতে 'অন্বেষা' অনুষ্ঠানে শুনলাম সাধারণ পুকুরের জলকে সহজে পানীয় জলে রূপান্তরে একটি সহ পদ্ধতির কথা। এক ভদ্রলোক ওই অনুষ্ঠানে জানালেন যেকোন পুকুরের জলকে কোনভাবে স্বচ্ছ করে নিতে হবে (ফটকিরি দিয়ে)। পরিষ্কার ও স্বচ্ছ ২ লিটারের বোতলে ওই জল ভর্তি করতে হবে। দেখতে হবে যাতে বোতলের নীচটাও পরিষ্কার দেখা যায়। বোতলকে ভালো করে ছিপি বন্ধ করে ৬ ঘন্টা কড়া রোদে শুয়ে রাখতে হবে। এরপর বোতলের জল পানের উপযোগী হয়ে উঠবে। এই পদ্ধতিতে সহজে গ্রামের মানুষ নিজেরাই পানীয় জল তৈরী করে নিতে পারেন—পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে সহজ, কিন্তু এটি কি বিশুদ্ধ পানীয় জল হবে ? রেডিওতে আলোচকের মতে এটি বিশুদ্ধ জল এবং পানের উপযোগী।

আমার অনুরোধ এই পদ্ধতিটির নাম জানাবেন এবং এই পদ্ধতিতে প্রকৃতই পানীয় জল সমস্যার সহায়ক হবে কিনা তা খোঁজ নিয়ে জানান এবং পুরো পদ্ধতিটি আপনাদের কাগজে ছাপান। এতে গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন। আমাদের মত গ্রামবাসীরাও সহজে পানীয় জল তৈরী করে পানীয় জলের কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাবে।

নমস্কারান্তে— *ড. প্রবাল কান্তি হাজরা*, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
গ্রাম-দেউলপোতা, পোঃ দেউলপোতা-কেশবচক, ভায়া-কলাগাছিয়া, থানা-খেজুরী, পূর্ব - মেদিনীপুর, ৭২১৪৩২

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in